সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম

অধীন/অধীনে/অধীনস্থ

‘অধীনস্থ’ ভুল শব্দ। এর কোনও প্রয়োগ চলবে না। ‘অধীন’ ও ‘অধীনে’ ব্যবহৃত হয়, তবে কিছুটা ভিন্ন অর্থে। যেমন—‘এটি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি দপ্তর।’ ‘সালাম সাহেব আমার অধীনে কাজ করেন।’

ই-কার, ঈ-কার (ি, ী)

সব অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দে সবসময় ই-কার (ি) বসবে। যেমন—

শাড়ি, বাড়ি, দাদি, রপ্তানি, বুজরুকি ইত্যাদি।

দেশ, ভাষা, জাতির নাম ই-কার (ি) দিয়ে লেখা হয়। যেমন—

ইংরেজি, জার্মানি, মারাঠি ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : চীন, চীনা।

ইত্যাদি/প্রভৃতি

‘ইত্যাদি’ এবং ‘প্রভৃতি’-র মধ্যে কার্যত অর্থগত কোনও পার্থক্য নেই; এই দুটি শব্দ বিকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উ-কার, ঊ-কার (ু, ূ)

অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দে সবসময় উ-কার (ু) বসবে। যেমন—

ঊনবিংশ (তৎসম)	উনিশ (তদ্ভব)
ধূলি (তৎসম)	ধুলা/ধুলো (তদ্ভব)
পূর্ব	পুব

‘অদ্ভুত’ ছাড়া আর সব শব্দে ‘ভূত’ ঊ-কার দিয়ে লেখা হয়। যেমন—

কিম্ভূতকিমাকার, ভূতপূর্ব, অভূতপূর্ব ইত্যাদি।

উদ্দেশ্যে/উদ্দেশে

‘উদ্দেশে’ অর্থ ‘প্রতি’, ‘লক্ষ্য করে’, যেমন—‘সবার উদ্দেশে সালাম জানাই’, ‘তিনি জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন’ ইত্যাদি। অন্যদিকে, ‘উদ্দেশ্যে’ অর্থ ‘লক্ষ্য নিয়ে’, ‘অভিপ্রায়ে’, যেমন—‘তুমি যে-উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ তা সফল হবে।’

উদ্ধৃতিচিহ্ন (‘ ’ / “ ”)

উদ্ধৃত শব্দের দুইদিকে একক উদ্ধৃতিচিহ্ন (**‘ ’**) এবং বাক্যাংশ বা বাক্যের দুইদিকে দ্বৈত উদ্ধৃতিচিহ্ন (**“ ”**) বসবে। উদ্ধৃত একাধিক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে কেবল শুরুর উদ্ধৃতিচিহ্ন (“) বসবে। সবগুলো অনুচ্ছেদ শেষ হবার পরই কেবল শেষের উদ্ধৃতিচিহ্ন (”) বসবে।

উপলক্ষ/উপলক্ষ্য

২০১৬ সালের বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান-এ 'উপলক্ষ' বাদ দিয়ে 'উপলক্ষ্য' গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত যৌক্তিক। সংসদ বাংলা অভিধান-এ অবশ্য দুটিকেই রাখা হয়েছে। তবে 'উপলক্ষ্য'-ই গ্রহণযোগ্য, সুতরাং 'উপলক্ষ' না লেখাই সমীচীন।

উপসর্গের লিখনরীতি

উপসর্গগুলো স্বতন্ত্র শব্দ নয়, এগুলো অন্য শব্দের আগে যুক্তভাবে বসে। তিন প্রকার উপসর্গ আছে : সংস্কৃত, খাঁটি বাংলা ও বিদেশি। এগুলো সবই অন্য শব্দের পূর্বে যুক্তভাবে বসবে। যেমন—

প্র (প্রমার্জন)	আম (আমজনতা)
পরা (পরাজয়)	লা (লাজবাব)
অপ (অপসংস্কৃতি)	পাতি (পাতিলেবু)
উপ (উপসচিব)	অতি (অতিবৃষ্টি)
অনা (অনাবৃষ্টি)	অধি (অধিভুক্ত)
অজ (অজপাড়াগাঁ)	ইতি (ইতিকর্তব্য)

উল্লিখিত/উল্লেখিত

'উপরে/আগে লিখিত', 'পূর্বোক্ত' অর্থে 'উল্লিখিত' ব্যবহৃত হয়। 'উল্লেখকৃত' অর্থে 'উল্লেখিত' ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নেই। এটি না লেখাই শ্রেয়।

ঋ-কার, র-ফলা (ৃ , ্র)

বিদেশি শব্দে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋ-কারের (ৃ) পরিবর্তে ই-কার সহযোগে র-ফলা (্র) ব্যবহৃত হবে। যেমন—

~~খৃস্টাব্দ~~	খ্রিষ্টাব্দ
~~বৃটিশ~~	ব্রিটিশ

এ/এই, ও/ওই, যে/যেই, সে/সেই

বিশেষণের মতো অর্থ অনুযায়ী 'এ', 'ও', 'যে', 'সে' কখনও স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে, কখনও পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হবে। যেমন—'এবেলা (দিনের এই সময়ে) ভাত খেয়ো না', 'ওবেলা (দিনের পরবর্তী ভাগে) এসো', 'ও জিনিস (একটা নির্দিষ্ট জিনিস) না নেওয়াই ভালো', 'এ লোকটা (একটা নির্দিষ্ট লোক) তো কথাই শুনছে না', 'যেদিন (যখন) তুমি আসবে', 'যে দিন গিয়েছে', 'সে বেচারা,' 'সেসব আর বোলো না' ইত্যাদি। এই, সেই, যেই যথাক্রমে এ, সে, যে-এর সমার্থক। আবার কখনও কখনও তারা আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এরা সংশ্লিষ্ট বিশেষ্যকে আরও সুনির্দিষ্ট করে বোঝায়, তবে সেক্ষেত্রে হাইফেন ব্যবহার করাই শ্রেয়। যেমন—'এ-ই সে লোক', 'সে-ই যাবে', 'যে-ই কথাটা বলুক', 'ও-ই আসল লোক' ইত্যাদি।

একবচন : -টি

একবচনসূচক '-টি' সবসময় বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্তভাবে বসবে। যেমন—'লোকটি', 'কথাটি' ইত্যাদি।

একবিন্দু (.), ত্রিবিন্দু (...)[১]

বাংলায় শব্দ সংক্ষেপণের জন্য একবিন্দু ব্যবহার করা যায়। যেমন—'ড.' বা 'ডা.'। অসম্পূর্ণ বাক্য বা উদ্ধৃতি বোঝাতে ত্রিবিন্দু ব্যবহৃত হয়। যেমন—

> "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
>
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে..."

অসম্পূর্ণ পদ্য-অনুচ্ছেদ তথা অনুল্লিখিত পঙ্‌ক্তি বোঝাতে ত্রিবিন্দু বাক্যের শেষে না লিখে একটি পঙ্‌ক্তি হিসেবে লেখা হয়। যেমন—

> "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
>
> কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
>
> ...
>
> কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।"

এ-কার (ে, ে)

শব্দের শুরুর এ-কার মাত্রাহীন (ে) হয়। যেমন—বেলা, লেখা, খেলা ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যকার এ-কার মাত্রাযুক্ত (ে) হয়। যেমন—শেষবেলা, স্মৃতিলেখা, ধূলিখেলা ইত্যাদি।[২]

-এর, -য়ের, -র

'-এর' এবং '-র' সাধারণভাবে বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হবে। যেমন—বনের রাজা, ঢাকার ইতিহাস, জামাইয়ের বাড়ি, ইনস্টিটিউটের কর্মপদ্ধতি, ঢাকার ছেলে ইত্যাদি। তবে কোনও নামবিশেষকে আলাদা করে দেখানোর প্রয়োজনে '-এর' রূপটি ব্যবহার করা হয়। যেমন—'বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতিষ্ঠাদিবস', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "হারানের নাতজামাই"-এর কাহিনি', 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর আয়োজন' ইত্যাদি। অনেকে 'শামসুর রাহমান-র' লিখে থাকেন। এটি শ্রুতিকটু এবং অস্বাভাবিক।

ঐ/ওই

আনুষ্ঠানিক প্রমিত ব্যবহারে কেবল 'ঐ' লেখা হবে। যেমন—

> ১৯৭১ সাল আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। ঐ বৎসরে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

---

[১]শব্দদুটি হায়াৎ মামুদের বাংলা লেখার নিয়মকানুন বইটি থেকে নেওয়া।

[২]বিজয় কী-বোর্ডে এ-কার চাপলে মাত্রাযুক্ত এ-কার লেখা হয়। তবে 'স্পেস' চেপে তারপর এ-কার চাপলে মাত্রাহীন এ-কার পাওয়া যায়। ইউনিকোড কী-বোর্ডে স্বাভাবিকভাবেই মাত্রাহীন ও মাত্রাযুক্ত এ-কার লেখা যায়।

ও-কার

লিখনরীতির ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা বজায় রাখার তাগিদে শব্দশেষের ও-কার যথাসম্ভব ব্যবহার বর্জন করা হবে। যেমন—ছিল, গেল, রইল, এত (তবে 'তো', 'এ তো' ও-কার দিয়ে লেখা হবে), ভীত ইত্যাদি। তবে যেসব শব্দের ক্ষেত্রে অর্থগত বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে, সেসব শব্দের শেষে ও-কার ব্যবহার করা হবে। যেমন—কালো (রং অর্থে), ভালো (গুণ অর্থে), রসালো (গুণ অর্থে), মতো (তুলনা অর্থে)।

সংখ্যাবাচক শব্দের বানান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ও-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন—এগারো, বারো, তেরো ইত্যাদি।

-কালীন

'কালীন' (কাল + ঈন) সবসময়ই ঈ-কার সহযোগে লিখতে হবে। যেমন—সন্ধ্যাকালীন, তৎকালীন ইত্যাদি।

কী, কি, কি না, কিনা, নাকি

বিস্ময়, প্রশ্ন ইত্যাদি অর্থে বিশেষণ এবং সর্বনাম রূপে স্বতন্ত্র পদ হিসেবে 'কী' ব্যবহৃত হয়। অন্য কথায় 'কী' কথাটির ওপর যখন জোর পড়ে তখন তা ঈ-কার দিয়ে লেখা হয়। যেমন—'কী সুন্দর!' 'এখানে কী কাজে এসেছ?' অন্যদিকে, সংশয় কিংবা প্রশ্ন বোঝাতে অব্যয় হিসেবে 'কি' ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে 'কি'-এর ওপর জোর পড়ে না। যেমন—'সে কি আসবে?'

অন্য একটি উদাহরণে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে :

তুমি কি খাবে? এখানে শ্রোতা খাবেন কিনা তা জানতে চাওয়া হচ্ছে।

তুমি কী খাবে? এখানে শ্রোতা কোন খাবারটি খাবেন তা জানতে চাওয়া হচ্ছে।

'কি না' সংশয়, বিতর্ক, প্রশ্ন ইত্যাদি অর্থে অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আপনি খাবেন কি না মা জানতে চাইল।

অর্থহীন বাগ্‌ভঙ্গি হিসেবে, কিংবা কোনও কিছুর কারণ বোঝাতে 'কিনা' যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—এত্তটুকু ছেলে কিনা আমার কথার ভুল ধরে! ঘটে বুদ্ধি কম কিনা, তাই আমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছ না।

অন্যদিকে, 'নাকি' সংশয়, সন্দেহ, বিতর্ক, প্রশ্ন ইত্যাদি অর্থে অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আমার সঙ্গে যাবেন নাকি? এ ব্যাটা নাকি আবার বিদ্যার জাহাজ!

'-কে'

ব্যাকরণগতভাবে অপরিহার্য না হলেও অর্থ স্পষ্ট করার প্রয়োজনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে '-কে' ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—আমাদেরকে একটু বিবেচনা করুন।

কোলন/কোলন-ড্যাশ/বিসর্গ (:/:—/ঃ)

বাক্যের পূর্ববর্তী অংশের ব্যাখ্যা কিংবা উদাহরণ উপস্থাপনের আগে কোলন ব্যবহার করা হয়। যেমন—

নিম্নলিখিত গাছগুলো কাঠের ভালো উৎস :

সেগুন
মেহগনি
কাঁঠাল

কোলন-ড্যাশের ব্যবহার বর্তমানে নেই। কোলন (:) হিসেবে বিসর্গ চিহ্ন (ঃ) ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কোলন-এর আগে ১টি 'স্পেস' ব্যবহৃত হবে। কোলনের পরেও একই লাইনে আরও টেক্সট থাকলে কোলনটির পরে একটি স্পেস দিতে হবে। অন্যদিকে, বিসর্গ বস্তুত একটি বর্ণ; এটি কোনও যতিচিহ্ন নয়। সাধারণত শব্দের মাঝখানে বিসর্গ বসে। যেমন—দুঃখ, দুঃশাসন, পুনঃপুন ইত্যাদি। শব্দের শেষে বিসর্গের ব্যবহার নেই। যেমন—প্রধানত ('প্রধানতঃ' নয়), অংশত ('অংশতঃ' নয়)।

ঙ, ং

সন্ধিসাধিত তৎসম শব্দে পূর্বপদের 'ম্' স্থানে 'ং' হবে। যেমন—সংগীত (সম্ + গীত), ভয়ংকর (ভয়ম্ + কর), সংগত (সম্ + গত)। সন্ধি না হলে 'ঙ'-এর সঙ্গে পরবর্তী বর্ণ যুক্তভাবে বসবে। যেমন—অঙ্ক ('অংক' নয়), প্রত্যঙ্গ, সঙ্গ ইত্যাদি।

অ-তৎসম শব্দে উচ্চারণ হলন্ত হলে শব্দের শেষে ও মধ্যে ং ব্যবহৃত হবে। যেমন—রং, জং, ঢং, গাং, বাংলা ইত্যাদি। তবে উচ্চারণে ং-এর সঙ্গে স্বর থাকলে ঙ ব্যবহৃত হবে। যেমন—রঙের, ঢঙের, গাঙের, বাঙালি।

ঙ্গ/ঙ্গ

অ-তৎসম বা সংস্কৃতজাত শব্দে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'ঙ্গ'-এর পরিবর্তে 'ঙ' লেখা হয়, তবে তৎসম শব্দে 'ঙ্গ'-ই লেখা হয়। যেমন—অঙ্গুলি ('অঙুলি' নয়), আঙুল ('আঙ্গুল' নয়)। আবার 'রঙ্গমঞ্চ' ('রঙমঞ্চ' নয়), 'রঙ্গন' ('রঙন' নয়), 'অঙ্গন' (কিন্তু 'আঙিনা', 'আঙ্গিনা' নয়), 'রঙ্গ' (কৌতুক, আনন্দ ইত্যাদি অর্থে) ইত্যাদি যে-কোনও রীতিতেই অভিন্ন। পুরোনো 'ঙ্গ' রূপও এখন আর না লেখাই সমীচীন। আরও কিছু উদাহরণ : লাঙল, কাঙাল, ধাঙর, মাছরাঙা, বাঙালি, চাঙর, রঙিলা, রঙিন, রাঙা ইত্যাদি। তবে স্থাননামের ও অন্য যে-কোনও নামের বানান অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন—রাঙ্গামাটি।

চন্দ্রবিন্দু (ঁ)

যে-বর্ণের সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারিত হবে, সেই বর্ণের সঙ্গে যুক্ত স্বরচিহ্নের উপরে চন্দ্রবিন্দু বসবে। যেমন—চাঁদ, হাঁস।[৩]

ড্যাশ (—)

ড্যাশ একটি যতিচিহ্ন এবং এটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। অনেক সময় ড্যাশ, কমা, সেমিকোলন, কোলন একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। আবার একটি বাক্যের মাঝখানে একটি ব্যাখ্যাসূচক খণ্ডবাক্য থাকলে সেই খণ্ডবাক্যের দুইদিকে ড্যাশ বসে। যেমন—'নদীমাতৃক বাংলাদেশ—নদীবিধৌত দেশ বলে এই নাম—পৃথিবীর অন্যতম উর্বর অঞ্চল।' ড্যাশের দুইদিকে কোনও 'স্পেস' থাকবে না।

---

[৩]অভ্র কী-বোর্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ব্যঞ্জনের পর স্বরচিহ্নের পরই কেবল চন্দ্রবিন্দু বসতে পারে। বিজয় কী-বোর্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন কিংবা স্বরচিহ্নের উপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া যায়।

ণ, ন

তৎসম শব্দে ণ-এর ব্যবহার ণত্ব বিধান (ণত্ব বিধান দ্রষ্টব্য) দ্বারা সুনির্দিষ্ট। দেশি ও বিদেশি শব্দে ণ-এর ব্যবহার নেই।

ত/ৎ

তৎসম শব্দের 'ৎ' অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেমন—আত্মসাৎ, তৎক্ষণাৎ, বিদ্যুৎ। শব্দশেষের 'ৎ'-এর পর '-এ', '-এর' ইত্যাদি স্বরযুক্ত বিভক্তি থাকলে 'ৎ' 'ত'-এ রূপান্তরিত হবে। যেমন—বিদ্যুতের।

তৈরি/তৈরী

'তৈরী' বানানটি বর্তমানে বর্জন করা হয়েছে। 'প্রস্তুত' এবং 'প্রস্তুত করা' উভয় অর্থেই 'তৈরি' শব্দটি ব্যবহৃত হবে। যেমন—'জামাটা রেশমের তৈরি।' 'কামার লোহা দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করে।'

দাঁড়ি (।)

বিবৃতিমূলক বাক্যের শেষে দাঁড়ি (।) বসে। এরকম বাক্যে প্রশ্ন বা বিস্ময়ভাব থাকলেও দাঁড়ি বসবে। যেমন—

আসাদ জানতে চাচ্ছে এখন কয়টা বাজে।

এভাবে আর কতদিন চলবে কে জানে।

এই দুনিয়ায় যে কতরকম মানুষ আছে, মায়ের মুখে গল্প শুনে সেটা বুঝলাম।

দু-, দূ-

সংস্কৃত 'দুঃ' উপসর্গটি দুঃখ, নিষেধ, অভাব, দুষ্ট, মন্দ, কঠিন ইত্যাদি নেতিবাচক অর্থগত ব্যঞ্জনা দেয়। যেমন—দুর্ভিক্ষ, দুর্জন, দুর্দিন, দুঃসাধ্য, দুরূহ ইত্যাদি। তাই এই শব্দগুলোতে 'দু' (উ-কার যুক্ত) ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে কোনও শব্দে 'দূর' থাকলে তা স্বাভাবিকভাবেই 'দূ' (ঊ-কার যুক্ত) দিয়ে লেখা হয়। যেমন—দূরত্ব, দূরীকরণ, দূরীভূত ইত্যাদি। 'দুই' অর্থে 'দু' ব্যবহৃত হয়, যেমন—দুকথা, দুকূল ইত্যাদি।

দু'টাকা/দুটাকা, পাঁচশ'/পাঁচশ

দাপ্তরিক ও আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে পূর্ণরূপ 'দুই টাকা', 'পাঁচশত টাকা', 'ছয়টা বাজে' লেখা সমীচীন। সেক্ষেত্রে দুটি শব্দকে আলাদাভাবে লিখতে হবে। 'দুটাকা' লেখার প্রয়োজন হলে তা একসঙ্গে লিখতে হবে। কোনও ঊর্ধ্বকমার প্রয়োজন নেই। একইভাবে 'পাঁচশ', 'ছদিন', 'ছটা বাজে' লেখা চলবে। তবে দাপ্তরিক এবং অন্য যে-কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে 'ছদিন', 'ছটা' ইত্যাদির পরিবর্তে এগুলোর পূর্ণরূপ 'ছয় দিন', 'ছয়টা' ব্যবহার করতে হবে।

না, -নি, নাই, নেই, নই, নয়

'-নি' ছাড়া আর সবগুলোই স্বতন্ত্রভাবে লেখা হয়। যেমন—'কাজল কথা বলে না', 'কাজল কথা বলে নাই' ('নাই' আঞ্চলিক ও সাধু রূপে ব্যবহৃত হয়, চলিত ও প্রমিত রূপে নয়), 'কাজল কথা বলেনি', 'কাজল ঘরে বসে নেই,' 'আমি কাজল নই', 'কাজল আমার মতো নয়'।

-নির্বিশেষে

'নির্বিশেষে' অন্য শব্দের পরে যুক্তভাবে (দীর্ঘ শব্দ হলে হাইফেনসহযোগে) বসে। যেমন—বয়সনির্বিশেষে, জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে।

নেই/নিই

'নেওয়া' অর্থে 'নেই' ব্যবহৃত হয় না, এটি অনুপস্থিতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আরিফ এখানে নেই। অন্যদিকে, উত্তম পুরুষে 'নেওয়া' অর্থে 'নিই' ব্যবহৃত হয়। যেমন—আমি সবসময় ভালোটাই নিই।

প্রতি, -প্রতি, প্রতি-

'প্রতি' অর্থ অনুযায়ী মুক্ত ও যুক্তভাবে (শব্দের শুরুতে ও শেষে) বসে। যেমন—

প্রতি বসন্তে পৃথিবী ফুলে ফুলে সেজে ওঠে।

আমি প্রতিদিন (প্রত্যহ, daily) এক মাইল হাঁটি।

জনপ্রতি একসের চাল পেল গরিবরা।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নের আগে ১টি 'স্পেস' ব্যবহার করা সংগত।

প্রায়/-প্রায়

বিশেষণবাচক 'প্রায়' শব্দটি সাধারণত একাধিক অর্থে স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিশেষ্য বা বিশেষণের আগে বসে। যেমন—প্রায় দশ মণ, তিনি প্রায়ই এখানে আসেন ইত্যাদি। তবে 'মতো' অর্থে এটি বিশেষণের পরে মুক্ত বা যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—ভগ্নপ্রায়, পাগলপ্রায়, পাগলের প্রায় ইত্যাদি।

বন্ধনীর ব্যবহার

বাংলা লিখনরীতিতে দ্বিতীয় বন্ধনীর ({ }) ব্যবহার সাধারণত নেই। তৃতীয় বন্ধনী ([ ]) ব্যবহৃত হয় মূল রচয়িতার রচনায় সম্পাদক বা অন্য কেউ যে-ব্যাখ্যা বা অনুমিত শব্দ (মূল পাঠ অস্পষ্ট বা ভুল থাকলে, কিংবা উদ্ধৃতাংশের অর্থ স্পষ্ট করার প্রয়োজনে) যোগ করেন, সেই শব্দ বা শব্দাবলি। যেমন—

সেদিন [গত বুধবার] তো আমি [ঢাকায়] ছিলাম না।

প্রথম বন্ধনী (( )) ব্যবহৃত হয় কোনও শব্দ বা বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা কিংবা উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজনে (উদাহরণ এই ভুক্তিতে দ্রষ্টব্য)।

বলো/বোলো, করো/কোরো

মধ্যম পুরুষে বর্তমান অনুজ্ঞায় 'বলো', 'করো' এবং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় 'বোলো', 'কোরো' ব্যবহৃত হয়। যেমন—'এখন তুমি আমাকে বলো', 'আজ শপথ করো', 'কাল তুমি আমাকে বোলো', 'সেদিন তুমি শপথ কোরো' ইত্যাদি। কোনও ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বকমা বা লোপচিহ্ন (') ব্যবহৃত হবে না। অনুরূপভাবে 'ফিরো' (<'ফেরো'), 'ধোরো' (<ধরো), 'চোলো' (<চলো) ইত্যাদি লেখা হবে।

বসেছিল/বসে ছিল

'বসেছিল' 'বসা' ক্রিয়ার পুরাঘটিত অতীতকালের রূপ। যেমন—একদিন এই ঘাটে সে এসে বসেছিল। অন্যদিকে, 'বসে ছিল' যৌগিক ক্রিয়া (একটি অসমাপিকা + একটি সমাপিকা ক্রিয়া)। যেমন—এই তো একটু আগেই লোকটা এখানে বসে ছিল ('বসে আছে' যৌগিক ক্রিয়ার সাধারণ অতীতকালের রূপ)।

বহু, বহুল

'বহুল' একটি বিশেষণবাচক শব্দ এবং অন্য শব্দের পরে বা আগে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—জনবহুল, ব্যয়বহুল, বহুলপ্রজ, বহুলপ্রচারিত। অন্যদিকে 'বহু' একটি বহুবচনবাচক পদ। যে-কোনও বিশেষণের মতোই এটি সাধারণত বিশেষ্যের আগে স্বতন্ত্রভাবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্যের আগে যুক্তভাবে বসে। যেমন—বহু মানুষ, বহুরূপী, বহুবার।

বহুবচন : -গুলি/-গুলো/-গুলা, -সমূহ, -বৃন্দ, -গণ ইত্যাদি

বহুবচনসূচক শব্দাংশ সবসময় বিশেষ্যের পরে যুক্তভাবে বসবে। যেমন—দিনগুলো, গ্রন্থসমূহ, শ্রোতৃবৃন্দ, ভদ্রমহোদয়গণ ইত্যাদি। '-গুলি', '-গুলো', '-গুলা' রূপসমূহের মধ্যে প্রমিত ও আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে '-গুলো' ব্যবহৃত হবে। 'সমূহ', 'গণ' অবশ্য বহুবচন নির্দেশ করা ছাড়াও ভিন্ন অর্থেও শব্দের আগে বসে। যেমন—'সমূহ ক্ষতি' (সার্বিক বা চরম অর্থে), 'গণনাট্য' (সাধারণ মানুষ অর্থে), 'গণধোলাই' (সম্মিলিত অর্থে) ইত্যাদি।

বাংলা লেখার মধ্যে ইংরেজি লেখার ফন্টের আকার

একই লেখায় ইংরেজি বর্ণ বাংলা বর্ণের চেয়ে ২ পয়েন্ট ছোটো হবে।

বাংলা হরফে বিদেশি শব্দ লিখন বা প্রতিবর্ণীকরণ (Transliteration)

বিদেশি ও বিদেশি উৎসজাত শব্দকে বাংলা বর্ণমালায় লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদেশি শব্দটির উচ্চারণ প্রধান বিবেচ্য। এ ক্ষেত্রে বাংলা এ, ঈ, ঊ, ণ, ন, স, শ, ষ, র, ড়, ঢ় বর্ণগুলোর ব্যবহার নিয়ে কিছু দ্বিধার কারণ থাকে। যথাসম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী প্রতিবর্ণীকরণ করলে এ সমস্যা এড়ানো যায়। এ ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম অনুসরণ করা সমীচীন :

উচ্চারণ 'অ্যা'-এর মতো হলে 'অ্যা' ব্যবহৃত হবে ('এ্যা', 'এ' নয়)। যেমন—অ্যাকাডেমি[৪], অ্যাসিড।

বিদেশি (এবং অ-তৎসম) শব্দের বানানে দীর্ঘস্বরের ব্যবহার হবে না, প্রায় সবক্ষেত্রেই হ্রস্ব ই-কার ও হ্রস্ব উ-কার ব্যবহৃত হবে। কিছু সুপরিচিত নামের বানানে ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন—চীন।

বিদেশি (এবং অ-তৎসম) শব্দে ড়, ঢ়, ণ-এর ব্যবহার হবে না।

বিদেশি (এবং অ-তৎসম) শব্দে স, শ, ষ-এর ব্যবহারের নিয়ম জানতে 'স, শ, ষ' ভুক্তিটি দেখুন।

---

[৪]'বাংলা একাডেমি' বানানে 'এ' থাকলেও বাংলা একাডেমির অভিধানে 'অ্যাকাডেমি' ভুক্তিটির বানান 'অ্যা' দিয়েই লেখা হয়েছে।

বিকল্পচিহ্ন (/)

'বা', 'অথবা' শব্দের পরিবর্তে কখনও কখনও বিকল্পচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—শরীরের উচ্চ তাপমাত্রা কমাতে ওষুধ এবং/অথবা পানি ব্যবহার করুন। লক্ষ করুন, এখানে বিকল্পচিহ্নের ব্যবহারের কারণে বাক্যটিকে সংক্ষিপ্ত করা সহজ হয়েছে। অন্য কোনওভাবে এটা করা সম্ভব হতো না। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে 'বা', 'অথবা' শব্দের স্থানে বিকল্পচিহ্ন ব্যবহার সংগত নয়। যেমন—"রহিম/করিম ওখানে যাবে" না লিখে "রহিম অথবা করিম ওখানে যাবে" লেখাই সমীচীন। প্রসঙ্গত, তারিখ লিখতে দৃশ্যত একই চিহ্ন ব্যবহৃত হলেও সেটি বিকল্পচিহ্ন নয়। বিকল্পচিহ্নের দুইদিকে কোনও 'স্পেস' থাকবে না।

বিনা, ছাড়া (ব্যতীত অর্থে)

'বিনা' সংশ্লিষ্ট শব্দের পরে স্বতন্ত্রভাবে বসে। যেমন—'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে'। শব্দের আগেও স্বতন্ত্রভাবে এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—বিনা মেঘে বজ্রপাত। 'ছাড়া' সংশ্লিষ্ট শব্দের পরে প্রায়শই স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—কাজ ছাড়া আর কিছু যেন নেই তার জীবনে। তবে শব্দের পরে যুক্তভাবেও এর ব্যবহার আছে। যেমন—লক্ষ্মীছাড়া, ছন্নছাড়া ইত্যাদি।

বিশেষণ লেখার নিয়ম

বাংলা বিশেষণ ও বিশেষণবাচক শব্দ সাধারণত বিশেষ্যের আগে স্বতন্ত্র শব্দরূপে বসে। যেমন—কালো কোকিল, লাল জামা, মন্দ লোক, এক টাকা, তিন দিন, মৃদু বাতাস, ধীরে চলো ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে বিশেষণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য থাকে বিশেষ্যটিকে বিশেষিত করা, ফলে বিশেষণটি বেশি গুরুত্ব পায়। তবে বিশেষ অর্থগত ব্যঞ্জনা থাকলে কখনও কখনও বিশেষণ বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্তভাবে বসে। যেমন—একদিন আমিও বড়ো হব। মন্দলোকে নানা কথা বলবে। এইসব ক্ষেত্রে বিশেষ্য ও বিশেষণ একটি একক ধারণা বা অর্থকে বোঝায়। সাহিত্যিক ব্যবহারে অবশ্য কখনও কখনও বিশেষ্যের পরেও বিশেষণ বসতে পারে। যেমন—'যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ', 'যে ফুল লাল', 'পিতা ভয়ংকর'।

বিস্ময়চিহ্ন (!)

বিস্ময়চিহ্নের আগে ১টি 'স্পেস' ব্যবহার করা সংগত। উল্লেখ্য, এককালে সম্বোধনসূচক শব্দের পরে বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হলেও এখন তার পরিবর্তে কমা (,) ব্যবহৃত হয়।

-বিহীন

'বিহীন' শব্দের পরে যুক্তভাবে বসবে। যেমন—লেজবিহীন, কারণবিহীন।

বোল্ড, আন্ডারলাইন, ইট্যালিক

কোনও শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যকে 'হাইলাইট' করার প্রয়োজনে বোল্ড বা আন্ডারলাইন করা যায়। বই, পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদির নাম ঊর্ধ্বকমার মধ্যে না লিখে 'ইট্যালিক' বা হেলানো হরফে লেখা হয়।

-ভাবে, -রূপে

'পদ্ধতিতে', 'ধরনে' অর্থে '-ভাবে' সবসময় সংশ্লিষ্ট শব্দের পরে যুক্তভাবে বসবে। যেমন—এভাবে, সম্পূর্ণভাবে ইত্যাদি। অন্যদিকে, '-রূপে'র ব্যবহার সাধারণত '-ভাবে'-র সঙ্গে অভিন্ন হলেও এর স্বতন্ত্র ব্যবহারও ব্যাকরণসিদ্ধ, তবে সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শব্দের রূপ ভিন্নতর হবে। যেমন—কীরূপ, যেরূপ, পক্ষীরূপে ইত্যাদি। কিন্তু 'পাখির রূপে', 'সুরের রূপে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'রূপে' আলাদা বসবে।

ভারি/ভারী

'ভারি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'খুব', 'অত্যন্ত' ইত্যাদি অর্থে। যেমন—'তোমার ভারি অহংকার হয়েছে।' এটি সাধারণত কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়। প্রমিত ব্যবহারে এর প্রয়োগ অসমীচীন। অন্যদিকে, 'ভারী' শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'ওজনদার', 'অতিরিক্ত ভারযুক্ত' অর্থে। যেমন—'ভারী বোঝা নিয়ে মজুররা চলেছে।' 'অসুস্থ অবস্থায় ভারী কাজ কোরো না।'

-ভিত্তিক

'ভিত্তিক' শব্দের পরে যুক্তভাবে বসবে। যেমন—বয়সভিত্তিক, জেলাভিত্তিক।

মহা-

'মহা-' সবসময় পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—মহাবীর, মহাগুণী, মহাআয়োজন ইত্যাদি।

মুখপত্র, মুখপাত্র

'মুখপত্র' হলো কোনও পত্রিকা বা প্রকাশনা যা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী, আদর্শ বা ব্যক্তির ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি প্রচার করে। 'মুখপাত্র' হলেন কোনও ব্যক্তি যিনি একই উদ্দেশ্যে কথা বলেন।

য, জ

বাংলায় য ও জ ধ্বনিদুটির উচ্চারণ অভিন্ন হলেও বানানে এদের ব্যবহারে পার্থক্য আছে; উদাহরণ হিসেবে 'জ্যৈষ্ঠ' ও 'যষ্ঠি' শব্দ দুটি লক্ষণীয়। এই দুটি বর্ণের ব্যবহারও সংশ্লিষ্ট শব্দের বানান মনে রাখার মাধ্যমেই কেবল মনে রাখা যেতে পারে।

যথা, যথাবিহিত

'যথা' ক্ষেত্র অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে ('যথা—', 'যথা আজ্ঞা মহারাজ') কিংবা পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে (যথাবিহিত, যথাযোগ্য, যথাতথা) ব্যবহৃত হতে পারে।

য-ফলা (্য) : কিছু বিভ্রান্তি

বিশেষণে য-ফলা (্য) নেই কিন্তু বিশেষ্যে আছে, যেমন—

দরিদ্র (বিশেষণ)	দারিদ্র্য (বিশেষ্য)
সমর্থ (বিশেষণ)	সামর্থ্য (বিশেষ্য)
নিঃশব্দ (বিশেষণ)	নৈঃশব্দ্য (বিশেষ্য)

বিশেষ্যে য-ফলা (্য) নেই কিন্তু বিশেষণে আছে, যেমন—

ওষ্ঠ (বিশেষ্য)		ওষ্ঠ্য (বিশেষণ)

কণ্ঠ (বিশেষ্য)		কণ্ঠ্য (বিশেষণ)

কিছু সাধারণ ভুল, যেমন—

~~ঐক্যমত~~		ঐকমত্য

~~অত্যাধিক~~		অত্যধিক

~~অনিন্দ্যনীয়~~		অনিন্দনীয়

~~লক্ষ্যণীয়~~		লক্ষণীয়

~~অচিন্ত্যনীয়~~		অচিন্তনীয়

যাবার/যাওয়ার, নেয়া/নেওয়া

'যাওয়ার/যাবার'; 'খাবার/খাওয়ার', 'নেওয়ার/নেবার' ইত্যাদি দুটি রূপই বিকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে প্রমিত ব্যবহারে 'নেয়া', 'দেয়া' প্রভৃতির পরিবর্তে 'নেওয়া', 'দেওয়া' ইত্যাদি ব্যবহার করাই সমীচীন।

যে, যে-, যেই, যে-ই

'যে' প্রয়োজন অনুযায়ী মুক্ত এবং যুক্তভাবে, এবং অর্থ স্পষ্ট করার তাগিদে দীর্ঘ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে হাইফেন সহযোগে, লেখা হবে। যেমন—

যেদিন তুমি আমার কাছে আসবে (সময় বোঝাচ্ছে)

যে দিন তুমি এসেছিলে (নির্দিষ্ট একটি দিনকে বোঝাচ্ছে)

তুমি যে এসেছিলে তা আমি বুঝিনি। (আসার ব্যাপারটিকে বোঝাচ্ছে)

তুমি যে-উপহার দিলে সেটা আমার কাছে অমূল্য। (উপহারটিকে বোঝাচ্ছে)

তুমি কথা দিয়েছিলে যে, আমার কথা মেনে চলবে।

'যেই' অর্থ 'যখনই' বা 'যে-মুহূর্তে', যেমন—যেই আমি তাকালাম অমনি সে মুখ লুকাল।

'যে-ই' অর্থ 'যে-ব্যক্তিই', যেমন—অপরাধ যে-ই করুক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

যেহেতু/যেইহেতু, সেহেতু/সেইহেতু

'যেহেতু' এবং 'যেইহেতু'-র মধ্যে বস্তুত কোনও পার্থক্য নেই। অনেকে মনে করেন, পরে 'সেইহেতু' থাকলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে 'যেইহেতু' লিখতে হবে। এটি ভুল ধারণা। 'যেহেতু...সেহেতু'/'যেহেতু...সেইহেতু' ('সেইহেতু'তে অর্থগত জোর পড়লে) সাধারণ ব্যবহার এবং আনুষ্ঠানিক প্রমিত ব্যবহার—উভয়ক্ষেত্রেই যথার্থ।

র, ড়, ঢ়

বাংলা বানানে ঢ়-এর ব্যবহার খুবই সীমিত, অল্পকিছু শব্দে এর ব্যবহার আছে। যেমন—গাঢ়, আষাঢ়, গূঢ়, নিগূঢ়, মূঢ়, বিমূঢ়, অনূঢ়া। ড়-এর ব্যবহার শব্দের শুরুতে নেই। র ও ড়-এর ব্যবহার কোনও সূত্র বা নিয়মের অধীন নয়; সংশ্লিষ্ট শব্দগুলো মনে রাখাই বানানে এই দুইটি বর্ণের ব্যবহার মনে রাখার একমাত্র উপায়।

রেফ (´)

রেফ (´) আসলে 'র্'-এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। অন্য সংক্ষিপ্ত রূপটি হলো র-ফলা (্র)। যে-ধ্বনির আগে রেফ (বা 'র্') উচ্চারিত হয় সেই ধ্বনিটির (অর্থাৎ বর্ণটির) ওপরে রেফ বসে।

যেমন—

ধ + র্ + ম = ধর্ম

লক্ষ/লক্ষ্য

'লক্ষ করা' একটি ক্রিয়াপদ। এর অর্থ 'খেয়াল করা', 'দেখা' ইত্যাদি। এতে য-ফলা নেই। যেমন—কদিন ধরেই লক্ষ করছি তোমার মনটা বেশ খারাপ।

'লক্ষ' শব্দের অন্য অর্থ একশ হাজার।

অন্যদিকে, 'লক্ষ্য' একটি বিশেষ্যপদ। এর অর্থ 'উদ্দেশ্য', 'নিশানা'। এতে য-ফলা আছে। যেমন—'জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবতার জন্য কাজ করা।' 'গাছ লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়লাম, ফল পড়ল না।'

লোপচিহ্ন (')

লোপচিহ্নের ব্যবহার যথাসম্ভব কম হবে। সংখ্যাবাচক শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের পরে লোপচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন—নটা বাজে। ছয়শ টাকা দাও।

কখনও কখনও অর্থ স্পষ্ট করার প্রয়োজনে লোপচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—মা'র হাতের রান্না সবসময় সুস্বাদু হয়।

শব্দশেষের 'ও', 'ই'

অধিকন্তু অর্থে শব্দশেষের 'ও' প্রত্যয় ও-কার (ে া) হিসেবে নয়, '-ও' হিসেবেই যুক্ত হবে। যেমন—কোনও ('কোনো' নয়), আরও ('আরো' নয়), আজও ('আজো' নয়), এবারও ('এবারো' নয়)। নিশ্চয়তা অর্থে 'ই'-ও অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হবে। যেমন—আজই ('আজি' নয়), তোমারই ('তোমারি' নয়) ইত্যাদি।

শব্দসংক্ষেপ

'মোঃ' ('মোহাম্মদ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) রূপটি ব্যক্তিনামের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই এটি এবং অনুরূপ শব্দগুলো বিসর্গসহযোগে লেখা হয়। অন্যান্য সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা (economy) অনুসরণ করা সমীচীন। যেমন—'ডক্টর'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ ড. ('ডঃ' নয়), হিসাববিজ্ঞান-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'হিবি' বা 'হি.বি.' ('হিঃ বিঃ' নয়) ইত্যাদি।

ষষ্ঠ/৬ষ্ঠ ইত্যাদি

তারিখবাচক শব্দ সংখ্যা ও কথার সহযোগে পূর্ণ রূপে লেখা হবে; তারিখ নির্দেশক সংখ্যার সঙ্গে 'ই' ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়। যেমন—৭ মে ২০১৬, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ইত্যাদি।

পূরণবাচক শব্দ কথায় বা সংখ্যাসহযোগে লেখা যেতে পারে। যেমন—দশম, ১০ম।

সংস্কৃত ভাষার সকল পূরণবাচক শব্দ বাংলায় ব্যবহার বাস্তবসম্মত নয়। ভাষাব্যবহারে জনগ্রহণযোগ্যতা কিংবা জনব্যবহারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বাংলায় 'বিংশতিতম'-এর স্থানে '২০তম', 'একত্রিংশত্তম'-এর স্থানে '৩১তম' ইত্যাদির ব্যবহার স্বচ্ছন্দ ও গৃহীত। দাপ্তরিক ক্ষেত্রে এই রূপগুলোর ব্যবহার চলতে পারে।

স, শ, ষ

বাংলা বানানে ষ-এর স্থান ষত্ব বিধান দ্বারা সুনির্দিষ্ট (ষত্ব বিধান দ্রষ্টব্য)। এই নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে। বিদেশি বা বিদেশি উৎসজাত শব্দে ষ-এর ব্যবহার নেই। এক্ষেত্রে স ও শ-এর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিদেশি শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী হবে।

উচ্চারণ ইংরেজি s-এর মতো হলে স ব্যবহৃত হবে। যেমন—স্টোর (store), সিট (seat)।

উচ্চারণ ইংরেজি sh-এর মতো হলে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন—শার্ট (shirt), শিট (sheet),

স্টেশন (station)।

-সংক্রান্ত

'সংক্রান্ত' সবসময় যুক্তভাবে ব্যবহৃত হবে। যেমন—এতৎসংক্রান্ত, বিবাহসংক্রান্ত।

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যাবাচক শব্দগুলো বৈশিষ্ট্যের বিচারে বিশেষণস্থানীয়। তাই এগুলোর ব্যবহার বিশেষণ শব্দের ব্যবহারের অনুরূপ হবে।

-সংশ্লিষ্ট, সংশ্লিষ্ট

'সংশ্লিষ্ট' যুক্ত (সমাসবদ্ধ) এবং মুক্ত উভয় রূপেই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—

বিষয়সংশ্লিষ্ট কথাই কেবল আলোচনার উপযুক্ত।

অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই ধন্যবাদের যোগ্য।

সঙ্গে/সাথে

'সাথে' কথ্য এবং কাব্যিক বা সাহিত্যিক রূপ। প্রমিত রূপ 'সঙ্গে'। আনুষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক ব্যবহারে 'সঙ্গে' লেখাই সমীচীন।

সব/-সব

'সব' যে-কোনও বিশেষণবাচক শব্দের মতোই সাধারণত সংশ্লিষ্ট শব্দের আগে স্বতন্ত্রভাবে কিংবা যুক্তভাবে বসে ('বিশেষণ লেখার নিয়ম' ভুক্তিটি দেখুন)। যেমন—সব লোক, সবসময় ইত্যাদি। শব্দের পরেও এটি বসতে পারে। যেমন—'ভাইসব', 'পাখিসব করে রব' ইত্যাদি।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার বানান : বলে, করে ইত্যাদি

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার উচ্চারণ অভিন্ন হয় না, যদিও বানান অভিন্ন হতে পারে। যেমন—শিউলি বলে গেল যে ও কাল আসতে পারবে না। (অসমাপিকা; বলিয়া→বলে)

শিউলি বলে যে ও মিষ্টি ভালোবাসে। (সমাপিকা)

অসমাপিকা ক্রিয়ার লুপ্ত ধ্বনি বা ধ্বনিগুলোকে বোঝাতে লোপচিহ্ন (') ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার লিখিত রূপ অভিন্ন হবে।

সমাসবদ্ধ শব্দ

সমাসবদ্ধ শব্দ একটি শব্দ হিসেবে লিখতে হবে। যেমন—সমুদ্রসৈকত, সান্ত্বনাসূচক, স্বাক্ষরযুক্ত, শিশুরোগ ইত্যাদি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অনেক সমাসসাধিত শব্দকে, বিশেষত জোড় শব্দগুলোকে, হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করে লেখা হয়। যেমন—ভালো-মন্দ, মা-বাবা, আলো-অন্ধকার, দক্ষিণ-পূর্ব ইত্যাদি।

সম্পন্ন, -সম্পন্ন

সচ্ছল বা সম্পদশালী অর্থে 'সম্পন্ন' একটি স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—কাশেম মিয়া চিরকালই সম্পন্ন গৃহস্থ। 'বৈশিষ্ট্যযুক্ত' অর্থে 'সম্পন্ন' অন্য শব্দের পরে যুক্তভাবে বসবে। যেমন—ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

-সহ, -সমেত, -সুদ্ধ

'সহিত' অর্থে '-সহ', '-সমেত' এবং '-সুদ্ধ' সবসময় সংশ্লিষ্ট শব্দের পরে যুক্তভাবে বসে। যেমন—'বইসহ পড়তে এসো', 'গ্রামসুদ্ধ লোক এসেছে', 'বাজারসমেত ব্যাগটা দাও' ইত্যাদি। 'সহ্য করা' অর্থেও 'সহ' শব্দের শেষে যুক্তভাবে বসে। যেমন—দুঃসহ, সর্বংসহা ইত্যাদি।

সহকারী, উপ-, যুগ্ম, অতিরিক্ত

উপরের চারটি বিশেষণপদের মধ্যে কেবল 'উপ-' একটি উপসর্গ। উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাই এটিকে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। যেমন—উপসচিব, উপপরিচালক, উপমহাপরিচালক, উপমহাহিসাবনিরীক্ষক, উপমন্ত্রী ইত্যাদি। 'সহযোগী' অর্থে 'যুগ্ম' যুক্তভাবেই লেখা সংগত। যেমন—যুগ্মসচিব। 'সহকারী', 'অতিরিক্ত' এবং 'জ্যেষ্ঠ' স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ শব্দ, তাই এগুলোকে আলাদাভাবে লেখাই যুক্তিযুক্ত। যেমন—সহকারী পরিচালক, অতিরিক্ত সচিব, জ্যেষ্ঠ (সিনিয়র) সচিব ইত্যাদি।

সহনীয়, সহনশীল

'সহনীয়' শব্দের অর্থ 'সহ্য করা যায় এমন'। অন্যদিকে, 'সহনশীল' শব্দের অর্থ 'সহ্য করতে পারে এমন'। সুতরাং, 'ভূমিকম্প-সহনীয় ইমারত' না লিখে 'ভূমিকম্প-সহনশীল ইমারত' লেখাই যথার্থ।

-সহযোগে

'সহযোগে' অন্য শব্দের পরে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—বন্ধুসহযোগে, মাংসসহযোগে।

সাধুরূপ, চলিতরূপ : নিবে/নেবে, দিবে/দেবে

ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 'নিবে', 'দিবে' একই সঙ্গে সাধু এবং আঞ্চলিক বা কথ্য রূপ। 'নেবে', 'দেবে' চলিত রূপ। তাই দাপ্তরিক লেখার কাজে সাধু রূপে 'নিবে', 'দিবে' এবং চলিত রূপে 'নেবে', 'দেবে' ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

-সাপেক্ষ, সাপেক্ষে

'শর্তে' অর্থে 'সাপেক্ষ' সচরাচর অন্য শব্দের পরে যুক্তভাবে বসে। যেমন—খরচসাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ, বিবেচনাসাপেক্ষ। 'সাপেক্ষে' স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—একটি বস্তুর গতি বিচার করা হয় অন্য বস্তুর সাপেক্ষে।

স্ত, স্থ

'স্থ' 'অবস্থিত' অর্থে বিশেষ্যের পরে যুক্তভাবে বসে। যেমন—মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, যন্ত্রস্থ ইত্যাদি। খেয়াল করলে দেখা যায়, 'স্থ' সাধারণত একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দের সঙ্গে বসে। অর্থাৎ, 'স্থ' বাদ দিলে একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ (বিশেষ্য) পাওয়া যায়। অন্যদিকে, 'স্ত' ব্যবহৃত হয় শব্দের passive রূপে। যেমন—অভ্যাস→অভ্যস্ত, বিন্যাস→বিন্যস্ত ইত্যাদি। শব্দ থেকে 'স্ত' বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশের কোনও অর্থ থাকে না।

হস্-চিহ্ন (্)

হস্-চিহ্নের ব্যবহার হবে অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে। নামের সঙ্গে কিংবা বিদেশি শব্দের উচ্চারণ পরিষ্কারভাবে বোঝানোর প্রয়োজনে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে। যেমন—আব্দুল্লাহ্, বাল্ব ইত্যাদি।

হাইফেন (-)

হাইফেন ড্যাশের চেয়ে ছোটো আকারের হয়। এটি বস্তুত কোনও যতিচিহ্ন নয়। সমাসবদ্ধ শব্দের সব সমস্যমান পদের অর্থ প্রধান হলে তাদের মধ্যে হাইফেন বসে। যেমন—বাবা-মা, পাহাড়-পর্বত। বিশেষ্যের আগে 'যে' বসে ঐ বিশেষ্যকে নির্দিষ্টভাবে বোঝালেও মাঝখানে হাইফেন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—আজ যে-অতীত তোমাকে ভোগাচ্ছে তাকে ভুলে যাও।

হাইফেনেরও দুইদিকে কোনও 'স্পেস' থাকবে না।

পরিশিষ্ট ১

বাংলা যুক্তবর্ণগুলোর বিশ্লিষ্ট রূপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুরোনো রূপ দেখানো হয়েছে)

ক্ব = ক্ + ব (নিক্বণ)

ক্ত = ক্ + ত (রক্ত)

ত্ত = ত্ + ত (আয়ত্ত)

ঞ্জ = ঞ্ + জ (গঞ্জ)

জ্ঞ = জ্ + ঞ (জ্ঞান)

হ্ণ = হ্ + ণ (অপরাহ্ণ)

হ্ন = হ্ + ন (মধ্যাহ্ন)

ঙ্গ (পুরোনো রূপ 'ঙ্গ') = ঙ্ + গ (ভঙ্গি)

ক্ষ = ক্ + ষ (রাক্ষস)

হ্ম = হ্ + ম (ব্রহ্মপুত্র)

ত্র =ত্ + র (পুত্র)

ক্র = ক্ + র (আক্রমণ)

ঞ্চ =ঞ্ + চ (বঞ্চনা)

ঞ্ছ = ঞ্ + ছ (লাঞ্ছনা)

ক্ষ্ম = ক্ষ্ + ম (লক্ষ্মী)

ষ্ণ = ষ্ + ণ (উষ্ণ)

রূ (পুরোনো রূপ 'রূ')= র্ + ঊ (রূপ)

পরিশিষ্ট ২

বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

১. তৎসম শব্দ

১.১ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ, কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন (ি ু) হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র; উর্ণা, উষা।

১.৩ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জ্জন, উর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য হবে না। এগুলোর পরিবর্তে অর্জন, উর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য হবে।

১.৪ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন : অহম্ + কার = অহংকার; এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে (ং) হবে না। যেমন : অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

১.৫ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়, যেমন : গুণী⟶গুণিজন; প্রাণী⟶প্রাণিবিদ্যা; মন্ত্রী⟶মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে, যেমন : গুণী⟶গুণীজন; প্রাণী⟶প্রাণীবিদ্যা; মন্ত্রী⟶মন্ত্রীপরিষদ।

ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন : কৃতি⟶কৃতিত্ব; দায়ী⟶দায়িত্ব; প্রতিযোগী⟶প্রতিযোগিতা; মন্ত্রী⟶মন্ত্রিত্ব; সহযোগী⟶সহযোগিতা।

১.৬ বিসর্গ (ঃ) : শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এ ছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন : দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

২. অতৎসম শব্দ

২.১ ই, ঈ, উ, ঊ : সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন (ি ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি; চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে 'কী' শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি! কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২.২ এ, অ্যা : বাংলায় 'এ' বর্ণ বা এ-কার দিয়ে 'এ' এবং 'অ্যা' উভয় ধ্বনিই নির্দেশিত হয়। যেমন : কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি; গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন। তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলোর 'অ্যা'-কারযুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে 'অ্যা' অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা 'অ্যা' -কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

২.৩ ও : বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন : কালো, খাটো, ছোটো, ভালো; এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো; করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো; কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো; করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো; করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো; কোনো, মতো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন : কোরো, বোলো, বোসো।

২.৪ ং, ঙ : শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে 'ঙ' হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

২.৫ ক্ষ, খ : অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

২.৬ জ, য : বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্প হিসেবে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন : আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

২.৭ মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন : অতৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহার করা হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ 'ণ' হয়; যেমন : কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল 'ন' হবে। যেমন : গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

২.৮ শ, ষ, স : বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন : কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন; আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব; স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর; ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন : পাসপোর্ট, বাস, ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে 'স' 'ছ'-এর রূপ লাভ করেছে, সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন : তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

২.৯ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ : বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন : মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

২.১০ হস্‌-চিহ্ন : হস্‌-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন : কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক। তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তা হলে হস্‌-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন : উহ্‌, বাহ্‌, যাহ্‌।

২.১১ ঊর্ধ্ব-কমা : ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

৩. **বিবিধ**

৩.১ সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে।

যেমন : অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিতে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়।

যেমন : কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

৩.২ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না।

যেমন : ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩.৩ না-বাচক 'না' এবং 'নি'-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

যেমন : করি না, কিন্তু করিনি।

এ ছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ ‘না’ উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

যেমন : নাবালক, নারাজ, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়।

যেমন : না-গোনা পাখি; না-বলা বাণী; না-শোনা কথা।

৩.৪ অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত ‘ও’ প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে।

যেমন : আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

৩.৫ নিশ্চয়ার্থক ‘ই’ শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে।

যেমন : আজই, এখনই।

৪. ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

পরিশিষ্ট ৩

তৎসম শব্দে ণ ও ষ ব্যবহারের নিয়ম : ণত্ব ও ষত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দসমূহে ণ ও ষ ব্যবহারের নিয়মাবলিই হলো ণত্ব ও ষত্ব বিধান। অ-তৎসম, অর্থাৎ তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা, দেশি ও বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে এই বিধানাবলি প্রযোজ্য নয়।

ণত্ব বিধান

১. ঋ, র, ষ বর্ণের পরে মূর্ধন্য-ণ বসে। যেমন—ঋণ, কর্ণ, উষ্ণ, তৃণ।

২. যদি ঋ, র, ষ বর্ণের পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ থাকে, তা হলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন—কৃপণ, নির্মাণ, গ্রহণ, স্মরণ।

৩. ট-বর্গের পূর্বের ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন—বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড। [লক্ষণীয় যে, লণ্ঠন শব্দটির বানানে মূর্ধন্য-ণ হবে না, কেননা এটি আসলে অ-তৎসম বা বিদেশি শব্দ; ইংরেজি Lantern শব্দের পরিবর্তিত রূপ হলো লণ্ঠন।]

৪. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন—অণু, আপণ [দোকান], লবণ, কল্যাণ, কঙ্কণ, কণিকা, কোণ, গণিকা, গুণ, গৌণ, নিপুণ, নিক্বণ, পাণি [হাত], পুণ্য, ফণী, বণিক, বাণী, বিপণি, বেণু, বীণা, বেণি, কণা, বাণিজ্য, চাণক্য, মণি, মাণিক্য, মণ [পরিমাপের একক], পণ, পণ্য, বাণ [তীর], ভাণ, ভণিতা, গণ, গণনা, গৌণ, নিপুণ, শোণিত, লাবণ্য ইত্যাদি।

৫. সমাসবদ্ধ শব্দে দুই পদের অর্থই প্রধান হলে ণত্ব বিধান প্রযোজ্য হয় না। যেমন—ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম।

৬. ত-বর্গীয় বর্ণের আগে কখনও মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন—প্রান্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

ষত্ব বিধান

১. ঋ-কার এবং র-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন—ঋষি, ঋষভ, বৃষ, বৃষ্টি, বর্ষা।

২. র-এর পরে অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে তারপরে ষ হয়। যেমন—পরিষ্কার। অ-ধ্বনি পূর্বে থাকে বলে ‘পুরস্কার’ শব্দে দন্ত্য-স হয়।

৩. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক, র বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন—ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু, চিকিৎসা ইত্যাদি। তবে সংস্কৃত সাৎ প্রত্যয়যুক্ত পদে ষ হয় না। যেমন—অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

৪. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে ষ হয়। যেমন—অভিষেক (অভি + সেক), অনুষঙ্গ (অনু + সঙ্গ), প্রতিষেধক (প্রতি + সেধক), অনুষ্ঠান (অনু +স্থান), বিষম (বি + সম), সুষুপ্ত (সু + সুপ্ত) ইত্যাদি।

৫. ট, ঠ-এর আগে ষ হয়। যেমন—কষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, নষ্ট। [লক্ষণীয় যে, ইংরেজি store শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ ষ্টোর হবে না, কেননা এটি তৎসম শব্দ নয়, বিদেশি শব্দ, তাই এক্ষেত্রে ষত্ব বিধান প্রযোজ্য হবে না, বরং ইংরেজি s ধ্বনিটির উচ্চারণ অনুযায়ী স ব্যবহৃত হবে।]

৬. কিছু শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন—আষাঢ়, নিষ্কর, পাষাণ, ষোড়শ ইত্যাদি।

বাঃসঃমুঃ-৩৯৮১ কম(বি-৩)-২০১৬/১৭—১০,০০০ বই, ২০১৭।

বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র

ভুক্তি	পৃষ্ঠা
অধীন/অধীনে/অধীনস্থ	১
ই-কার, ঈ-কার (ি, ী)	১
ইত্যাদি/প্রভৃতি	১
উ-কার, ঊ-কার (ু , ূ)	১
উদ্দেশ্যে/উদ্দেশে	১
উদ্ধৃতিচিহ্ন (‘ ’ / “ ”)	১
উপলক্ষ/উপলক্ষ্য	২
উপসর্গের লিখনরীতি	২
উল্লিখিত/উল্লেখিত	২
ঋ-কার, র-ফলা (ৃ , ্র)	২
এ/এই, ও/ওই, যে/যেই, সে/সেই	২
একবচন : -টি	৩
একবিন্দু (.), ত্রিবিন্দু (...)	৩
এ-কার (ে, ে)	৩
-এর, -য়ের, -র	৩
ঐ/ওই	৩
ও-কার	৪
-কালীন	৪
কী, কি, কি না, কিনা, নাকি	৪
‘-কে’	৪
কোলন/কোলন-ড্যাশ/বিসর্গ (:/:—/ঃ)	৪
ঙ, ং	৫
ঙ্গা/ঙ্গ	৫
চন্দ্রবিন্দু (ঁ)	৫
ড্যাশ (—)	৫
ণ, ন	৬
ত/ৎ	৬
তৈরি/তৈরী	৬

ভুক্তি	পৃষ্ঠা
দাঁড়ি (।)	৬
দু-, দূ-	৬
দু’টাকা/দুটাকা, পাঁচশ’/পাঁচশ	৬
না, -নি, নাই, নেই, নই, নয়	৬
-নির্বিশেষে	৭
নেই/নিই	৭
প্রতি, -প্রতি, প্রতি-	৭
প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)	৭
প্রায়/-প্রায়	৭
বন্ধনীর ব্যবহার	৭
বলো/বোলো, করো/কোরো	৭
বসেছিল/বসে ছিল	৮
বহু, বহুল	৮
বহুবচন : -গুলি/-গুলো/-গুলা, -সমূহ, -বৃন্দ, -গণ ইত্যাদি	৮
বাংলা লেখার মধ্যে ইংরেজি লেখার ফন্টের আকার	৮
বাংলা হরফে বিদেশি শব্দ লিখন বা প্রতিবর্ণীকরণ (Transliteration)	৮
বিকল্পচিহ্ন (/)	৯
বিনা, ছাড়া (ব্যতীত অর্থে)	৯
বিশেষণ লেখার নিয়ম	৯
বিস্ময়চিহ্ন (!)	৯
-বিহীন	৯
বোল্ড, আন্ডারলাইন, ইট্যালিক	৯
-ভাবে, -রূপে	১০
ভারি/ভারী	১০
-ভিত্তিক	১০
মহা-	১০
মুখপত্র, মুখপাত্র	১০
য, জ	১০
যথা, যথাবিহিত	১০
য-ফলা (্য) : কিছু বিভ্রান্তি	১০
যাবার/যাওয়ার, নেয়া/নেওয়া	১১

ভুক্তি	পৃষ্ঠা
যে, যে-, যেই, যে-ই	১১
যেহেতু/যেইহেতু, সেহেতু/সেইহেতু	১১
র, ড়, ঢ়	১২
রেফ (র্)	১২
লক্ষ/লক্ষ্য	১২
লোপচিহ্ন (’)	১২
শব্দশেষের ‘ও’, ‘ই’	১২
শব্দসংক্ষেপ	১২
ষষ্ঠ/৬ষ্ঠ ইত্যাদি	১৩
স, শ, ষ	১৩
-সংক্রান্ত	১৩
সংখ্যাবাচক শব্দ	১৩
-সংশ্লিষ্ট, সংশ্লিষ্ট	১৩
সঙ্গে/সাথে	১৩
সব/-সব	১৩
সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার বানান : বলে, করে ইত্যাদি	১৪
সমাসবদ্ধ শব্দ	১৪
সম্পন্ন, -সম্পন্ন	১৪
-সহ, -সমেত, -সুদ্ধ	১৪
সহকারী, উপ-, যুগ্ম, অতিরিক্ত	১৪
সহনীয়, সহনশীল	১৪
-সহযোগে	১৪
সাধুরূপ, চলিতরূপ : নিবে/নেবে, দিবে/দেবে	১৫
-সাপেক্ষ, সাপেক্ষে	১৫
স্ত, স্থ	১৫
হস্-চিহ্ন (্)	১৫
হাইফেন (-)	১৫
পরিশিষ্ট ১ বাংলা যুক্তবর্ণের বিশ্লিষ্ট রূপ	১৬
পরিশিষ্ট ২ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম	১৭
পরিশিষ্ট ৩ তৎসম শব্দে ণ এবং ষ ব্যবহারের নিয়ম : ণত্ব ও ষত্ব বিধান	২১